মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের কবিতা : ভাবরূপের পালাবদল

রফিকউল্লাহ খান

বাংলাদেশের সমাজমানস গোড়া থেকেই জটিল ও দ্বন্দ্বদীর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। একটি সমাজের সৃষ্টিশীল চৈতন্যের বিকাশ ও উত্তরণের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রগতিশীল চরিত্র এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত। কিন্তু এগুলো প্রতিষ্ঠার জন্যই পূর্বাপর সংগ্রাম করতে হয়েছে বাঙালি জাতিকে। সংগ্রামশীল মানব-অস্তিত্বের মৌলিক লক্ষণ হলো সঙ্ঘচেতনা তথা সমষ্টিসংলগ্নতা। ব্যক্তির বিকাশের স্বাধীন স্বাবলম্বনের শর্ত মেনে নিয়েও বলা যায়, বাংলাদেশের কবিতায় ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণ অপেক্ষা সমষ্টিলগ্ন চেতনাই অধিকতর ফলবতী হয়েছে। কিন্তু আধুনিক কবিতার স্বভাবধর্মই হচ্ছে ব্যক্তিচৈতন্যের স্বাবলম্বী আত্মপ্রকাশ। এ-ভূখণ্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণিবিকাশের যে জটিল বাস্তবতা আমরা লক্ষ করি, সেখানেও রয়েছে বহুবিধ অন্তঃঅসঙ্গতি। এই অসঙ্গতিতাড়িত সমাজে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সমগ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কবিদেরকেও সক্রিয় হতে হয়েছে। ফলে, ইউরোপীয় ধাঁচের ব্যক্তিবাদী কবিতার পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়নি। ঔপনিবেশিক নগর ও পরনির্ভরশীল আর্থ-উৎপাদন কাঠামোয় যে মধ্যবিত্ত মনের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে, সে মন মূলত সমাজসংলগ্ন, আত্মকেন্দ্রিকতার প্রশ্নে দ্বিধাদীর্ণ এবং স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন।

উনিশ শো একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের কবিতার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে, এটা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ছিলো। দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, স্বাধীন মানচিত্র, নিজস্ব পতাকা, সর্বোপরি সমাজের গুণগত পরিবর্তনের সমূহ সম্ভাবনায় সংবেদনশীল কবিচৈতন্য স্বভাবতই নবতর কাব্যবস্তু সন্ধানে তৎপর হবে। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ করলাম, বাংলাদেশের কাব্যস্বভাবে সূচিত হয়েছে এক জটিল জঙ্গম, যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় পূর্ববর্তী সময়পরম্পরার কবিগোষ্ঠী কাব্যোপকরণের প্রশ্নে প্রায় অভিন্ন বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে। একটা সামষ্টিক চরিত্রও বাংলাদেশের কবিতা এ-সময় অর্জন করে। ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরে অনেকটা এইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও ব্যক্তিসত্তার নব্যবিকাশের সম্ভাবনায় অনেক কবিই সামাজিক বক্তব্য প্রকাশের প্রশ্নে ব্যক্তিরুচিকেই প্রাধান্য দিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সংরক্ত চেতনা, গণতন্ত্রায়ন ও শিল্পায়নের অবাধ বিকাশের সম্ভাবনায় নবগঠিত রাষ্ট্রসত্তায় ব্যক্তির আকাশচুম্বী স্বপ্ন একটা সামষ্টিক চারিত্র্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে ষাটের দশকের শেষার্ধে উদ্ভূত অনেক কবি এবং সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক জঙ্গমতার মধ্যে আত্মপ্রকাশকামী তরুণ কবিদের মধ্যে কখনো কখনো চেতনাগত ঐক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুদ্ধোত্তর কালের নবোদ্ভূত কবিদের রক্তিম জীবনাবেগ, সদ্য স্বাধীন দেশের বাস্তবতায় সীমাতিরিক্ত প্রত্যাশা ও অবশ্যম্ভাবী

ব্যর্থতাবোধ; প্রেম ও নিসর্গভাবনায় প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতা প্রভৃতি একটা সামষ্টিক রূপ লাভ করে। ষাটের দশকের অনেক কবি স্ব-উদ্ভাবিত পরিণত আঙ্গিকে অভিন্ন কাব্যবস্তুকেই যেন প্রকাশ করলেন। ফলে, তরুণ কবিদের স্বতন্ত্র কাব্যস্বর অনেকের কাছেই অনুক্ত থেকে গেলো। এমনকি, পঞ্চাশের দশকের শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী, ষাটের দশকের অধিকাংশ কবিই নিজস্ব কাব্য-অবয়বে সমকালের সংরক্ত চেতনা ধারণা করলেন। ষাটের দশকের শেষ দিকে আবির্ভূত বেশ কয়েকজন কবি এ সময়ে আত্মপ্রকাশের তীব্রতায়, ব্যক্তি ও সমষ্টির নির্বাধ আবেগজীবন উন্মোচনের ঐকান্তিকতায় এবং দেশপ্রেমের জনরঞ্জক কাব্যকলা সৃষ্টিতে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এঁদের মধ্যে সিকদার আমিনুল হক, আসাদ চৌধুরী, আল মুজাহিদী, মহাদেব সাহা, মাহমুদ আল জামান, হুমায়ুন কবির, হুমায়ুন আজাদ, সানাউল হক খান, মাহবুব সাদিক, হাবিবুল্লাহ সিরাজী, জাহিদুল হক, অসীম সাহা, হেলাল হাফিজ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সংগ্রামী জীবনাকাঙ্ক্ষা এঁদের অধিকাংশেরই কবিতার মৌলিক লক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যায়ে এঁদের মধ্যে লক্ষ করবো সমাজসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার টানাপোড়েন, আত্মকেন্দ্রিকতার পরকীয়া উল্লাস, ব্যক্তিত্ববর্জিত আত্মরতি ও আত্মকুণ্ডলায়ন। তবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই বোধগুলো যুদ্ধের অব্যবহিত পরে তাঁদের কবিতায় গৌণ হয়ে পড়ে। এ সময় তাঁদের যে স্বভাবধর্ম সুস্পষ্ট হতে থাকে, তাহলো সঙ্ঘচেতনা ও সংগ্রামের প্রশ্নে সমষ্টিলগ্ন মানসিকতা, নাগরিক অনুভব প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত এবং প্রায়শই স্মৃতি, নস্টালজিয়া, নিসর্গ ও গ্রামীণ জীবনের প্রতি আকর্ষণ। এ সময়ের কবিতাকে বিশেষ চারিত্র্যে চিহ্নিত করাও একারণেই দুরূহ হয়ে পড়ে।

॥ দুই ॥

মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে যে-সকল নতুন কবি আবির্ভূত হলেন, দ্বিধাহীন আত্মপ্রকাশ-আকাঙ্ক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রের বস্তুগত পটপরিবর্তনের সুখবোধ ও আনন্দানুভূতি অনেকের স্বপ্নলোককেই করে তুললো বস্তুসম্পর্করহিত। প্রেম ও সংগ্রামের দ্বৈরথ অগ্রজদের কারো কারো মতো এঁদের আলোড়িত করেনি। বরং যুদ্ধোত্তর কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয় জীবনের বিপর্যয়, মুক্তিযুদ্ধ-অর্জিত চেতনার ক্রমবিলীয়মান রূপ, পাকিস্তানি আমলের পরাজিত দৃষ্টিভঙ্গির পুনরুত্থান, সেনাতন্ত্রের বিকৃত মুখচ্ছবি, গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, পরাজিত সাম্প্রদায়িকতার পুনরুজ্জীবন চেষ্টা এবং সংবিধানের মূলস্তম্ভগুলোর অপসারণ জাতীয় চৈতন্যকে নিক্ষেপ করে গভীর অন্ধকার ও অনিশ্চয়তার গহ্বরে। এই পরিস্থিতিতে সংবেদনশীল কবিচৈতন্যের যে প্রতিক্রিয়া, সমাজ ও সময়ের অন্তঃস্বর অনুধাবন তার তাৎপর্য অপরিসীম।

উল্লিখিত সমাজবাস্তবতা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সূত্র ধরেই আমাদেরকে সত্তরের দশকের কবিতার স্বরূপ নিরূপণ করতে হবে। এ সময়ের কবিতায় প্রধানত যে লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট, তা হলো, রক্তাক্ত যুদ্ধের অভিজ্ঞতার সমান্তরালে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা; বৃহৎ ত্যাগের অনুভবে আত্মমুগ্ধ অবসন্ন চৈতন্যের বাস্তবতা-অতিরেক স্বপ্ন-কল্পনা; ব্যর্থতাবোধের দ্রুত সম্প্রসারণ। এ-ব্যর্থতাবোধ ষাটের দশকীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, মূলত সমাজনির্ভর। এ সময়ের কবিতায় দেখা গেল প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের নতুন

চারিত্র্য; সংগ্রামী জীবনাকাঙ্ক্ষার নবতর মাত্রা; শ্রেণিবৈষম্য সম্পর্কে সজাগতা ও শ্রেণিসাম্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং এজন্য নবতর সংগ্রামের প্রস্তুতি। যতোটা সরলরেখায় লক্ষণগুলো উপস্থাপিত হলো, কবিতায় তার রূপায়ন অবশ্যই ততোটা সরল-বক্র রেখায় চিহ্নিত নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্তসহযোগে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেখা যেতে পারে। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে যাঁদের কবিতা রচনার সূত্রপাত, তাঁদের মধ্যে দাউদ হায়দার, আবিদ আজাদ, শিহাব সরকার, আবিদ আনোয়ার, বিমল গুহ, মুনীর সিরাজ, মাহবুব বারী, আবু করিম, মোস্তফা মীর, হাসান হাফিজ, সৈয়দ হায়দার, সৈকত আসগর, রবীন্দ্র গোপ, শামীম আজাদ, আবু কায়সার, আসাদ মান্নান, ইকবাল হাসান, দিলারা হাফিজ, মুজিবুল হক কবির, ময়ূখ চৌধুরী, মাসুদুজ্জমান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। প্রথম আত্মপ্রকাশ মুহূর্তে পূর্বতন কাব্যবিশ্বাসে অনাস্থা নিয়েও এঁদের জন্ম হয়নি। তবে অগ্রজ কবিদের অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে এই সব কবির অভিজ্ঞতার ভুবন স্বতন্ত্র। এই অভিজ্ঞতা কেবল বস্তুজাগতিক নয়, মানসিকও বটে। যেমন,

(১) গ্রামটা আমার ভেসে গেছে, চৈত্র এলেই পুড়ে যাবে
কাজের জন্য দুয়ার দুয়ার ঘুরেও কোনো ফল হবে না
এখন দেখি শহর আমায় রাখে কিনা

বেঁচে থাকার ইচ্ছে নিয়ে গ্রামটি ছেড়ে চলে এলুম
চলে এলুম তোমায় ছেড়ে চলে এলুম

(দাউদ হায়দার)

(২) আমাকে পাবে না। পাবে শুধু অচল দিবাবসান
অনুক্ষণ মরীচিকাপোড়া দিগন্তের ডান
বিসর্পিল শুষ্ক জিহ্বা ঝড়ে যাবে তোমার পথের
পিপাসার্ত নদী তোমাকে দেখিয়ে দেবে ভুল পথ

(আবিদ আজাদ)

(৩) সর্বজনীন সূর্য এসে এই বাড়িতে ডোবে
আঁধার-মুখো চাঁদের নটী উল্টো পায়ে নাচে
দেয়াল ফেটে রক্ত ঝরে জং ধরেছে কাঁচে
ক্লান্ত চড়ুই নিজের পাখা নিজেই ছেঁড়ে ক্ষোভে।
গোরের গানে তৃপ্তি খোঁজে নতুন কোনো র‍্যাঁবো
এই বাড়িকে জিয়ন-কাঁঠি ছুঁইয়ে কখন দেবো?

(আবিদ আনোয়ার)

(৪) নাচঘরে অস্থির ছুটোছুটি, সারা মঞ্চে আগুন
নিমেষে আমার পাণ্ডুলিপি কেড়ে নিয়ে
সামনে পেছনে প্রহরা
ক'জন গোয়েন্দা পরে আমার ভাষায় ইতিহাসও দাবি করে
তার চেয়ে শির কেটে নিলে না কেন?

(শিহাব সরকার)

(৫) অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে চলে আমার স্বদেশ
নবীন ভঙ্গিতে, এপাশ ওপাশ
ভারী মাথা নেড়ে নেড়ে হেঁটে যায়
মানুষের বসতির দিকে।

(বিমল গুহ)

যুদ্ধোত্তর সমাজে ব্যক্তিমানসের বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তার অস্থির চিত্র উল্লিখিত কাব্যাংশগুলো থেকে পাওয়া যায়। স্বপ্ন অপেক্ষা স্বপ্নভঙ্গজনিত ব্যর্থতাবোধই এখানে তীব্র। 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' কিংবা 'আজও আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই' জাতীয় উচ্চারণের মধ্যে অবলোকনের ভিন্নতা সত্ত্বেও যন্ত্রণার ঐক্য সুস্পষ্ট। প্রথম পর্বের কবিদের মধ্যে আবেগ ও যন্ত্রণার যে তীব্রতা, সেখানে নিকট অতীতের সংগ্রামশীল সংরক্ত চেতনা বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। মনে হয়, সমাজ ও জীবনের অব্যাহত ভাঙন কবিতার সংহত নিপুণ অবয়বেও এনে দিয়েছে বিস্রস্ত, এলোমেলো ভাব। জীবনে এক পাড় ভেঙে অন্য পাড় গড়ে উঠবে— সভ্যতা-শিল্পের ইতিহাসে এরকম দেখেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ-বৈগুণ্য কেবল ভাঙনের অব্যাহত প্রক্রিয়াকেই ত্বরান্বিত করছে। সংগ্রামের ফল ব্যর্থতার কালো রঙে অবগুণ্ঠিত, প্রেম ও নারী সান্নিধ্যে নেই স্বস্তি—চিরপরিচিত নিসর্গলোকের শুশ্রূষা থেকে ক্ষুন্নিবৃত্তি মানুষকে টেনে নিচ্ছে উদ্বাস্তু স্বপ্নের মোহে।

সত্তরের দশকের কবিরা জীবনের সদর্থক প্রান্তগুলোকে সজ্ঞানে পরিহার করতে চাননি, ষাটের দশকের কবিদের মতো। বরং জীবনের নেতিবাচক রূপের অব্যাহত আত্মপ্রকাশ তাঁদের পরাভবচেতনাকে ত্বরান্বিত করছে। ব্যক্তি, সমষ্টি, মানুষ, দেশ—এই সব বোধ তাঁদের ব্যর্থতাবোধের ব্যাকরণে নতুন তাৎপর্য আরোপ করেছে :

অন্তর্হিত যুদ্ধের গৌরব, নেকড়েদের ক্রূর দাঁত ক্ষুরধার
জীবনে আনন্দ নেই, চাষাবাদ অনুর্বর উষর জমিনে
আশার দুরাশা নেই, যাতে আমরা আশাবাদী হতে পারি

. .

নষ্ট ভ্রষ্ট সময়ের তপ্ত আর উদ্যত ফনার নিচে
দুঃখে-কষ্টে আমাদের জ্বলা-নেভা অনিশ্চিত বিষণ্ন বসতি

(হাসান হাফিজ)

এই 'বিপন্নতা' যে ব্যক্তিগত বিপন্নতা নয়, প্রায় সকল কবির দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেও যে রয়ে গেছে অন্তর্নিহিত ঐক্য, —এই লক্ষণ সত্তর দশকের কবিতার একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য। দশকের মধ্য পর্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে শুরু হয় ষড়যন্ত্র, হিংস্র-মত্তা ও রক্তপাত। ইতিহাসের পশ্চাৎগতি ও রাষ্ট্রাদর্শ থেকে মুক্তিযুদ্ধের চিহ্নসমূহের ক্রম-অপসারণ সমগ্র সমাজজীবনকেই নিক্ষেপ করে সীমাহীন তমসাগহ্বরে। কবিদের স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা আকাশচুম্বী পরাভবচেতনায় রূপ নেয়। এই পরিস্থিতিতে কবিদের মধ্যে সংরক্ত অনুভূতির পুনরুজ্জীবন ঘটে :

(১) হাত বাড়ালেই মুঠিতে রক্ত ঝরে
কার সন্তান কাটা বন্দুকে মরে

হিংস্র-স্বদেশ আমাকে পাঠাও দূরের নির্বাসনে

(কামাল চৌধুরী)

(২) অতোটা ফুলের প্রয়োজন নেই
ভাষাহীন মুখ নিরীহ জীবন
প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন নেই
কিছুটা হিংস্র বিদ্রোহ চাই কিছুটা আঘাত
রক্তে কিছুটা উত্তাপ চাই, উষ্ণতা চাই
চাই কিছু লাল তীব্র আগুন।

(রুদ্র মহম্মদ শহিদুল্লাহ)

(৩) আমার হৃদয় ভর্তি কথাগুলি
অব্যর্থ একটি মেশিনগানের মতোন মুখর হতে চায়।

(মাহবুব হাসান)

(৪) রক্ত এবং বোধে
তড়িৎ যেন ঝলক দিয়ে ওঠে
ইতিহাসের গভীরতায় কে
অস্ত্র শানায় নিজের ভিতর নিজে

(মাহমুদ শফিক)

এই প্রতিবাদী সদর্থক চেতনা এ-সময়ের অনেক কবির মধ্যেই নতুন কাব্যবোধের জন্ম দিয়েছে। তাঁরা নিসর্গ বন্দনার পরিবর্তে চেতনা প্রসারিত করেছেন বৃহত্তর জনপদে—প্রেমের ব্যর্থতাবোধকেও একটা তত্ত্বময় অভিজ্ঞানে পৌঁছে দিয়েছেন কোনো কোনো কবি।

সত্তর দশকের মধ্য পর্যায়ে যে সকল তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটে, তাঁদের মধ্যে নাসির আহমেদ, হালিম আজাদ, শিশির দত্ত, আবসার হাবীব, ইকবাল আজিজ, সোহরাব হাসান, ফারুক মাহমুদ, জাহিদ হায়দার, আশরাফ আহমদ, তুষার দাস, তসলিমা নাসরিন, জাফর ওয়াজেদ, আহমদ আজিজ, নাসিমা সুলতানা, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, মুহাম্মদ সামাদ, মাহমুদ কামাল, অনীক মাহমুদ, মোহন রায়হান, আবু হাসান শাহরিয়ার, সৈয়দ আল ফারুক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই প্রজন্মের কবিদের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্রতা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে সর্বগ্রাসী ব্যর্থতা ও হতাশার মধ্যেও শুশ্রূষার জন্য আকুতি। অবশ্য জাহিদ হায়দার ঘোষণা করেন,

এই জেনারেশন পায়নি কোনো প্রেম
জেগে উঠবার পর থেকে শুনেছে শুধু
ভাঙনের ঘণ্টাধ্বনি
অগ্রজের দীর্ঘশ্বাস
অদ্ভুত রাজনীতির রঙিন ঠোঁটের হাসি
তার বিকৃত শরীর ঘাম তেলে অত্যন্ত পিচ্ছিল
মানুষের হৃদয়ের লেনদেন তার কাছে বাসি।

প্রজন্মের চারিত্র্যনির্দেশক এই উচ্চারণ সত্ত্বেও জাহিদ হায়দার প্রেমের ব্যর্থতার নয়, প্রতীক্ষায় আস্থাশীল। প্রেমের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের তীব্রতায় কবিদের কাব্যোপকরণের ক্ষেত্র ক্রমাগত বিস্তৃত হয়েছে। যেমন—

(১) আমার ভেতরে আজও ঘুমিয়ে রয়েছে যে বাউল
সে যেন অন্তত একবার জেগে ওঠে,
পূর্ণ মানুষের মতো নিজেই নিজের গালে চুমু খেয়ে বলে :
এতকাল ভুল জলে স্নান করেছেন মহাশয়
জীবনের ভুল-ভাল কখনো চোখের জলে ধুয়ে নিতে হয়।

(নাসির আহমেদ)

(২) একটি নিটোল বিশ্বশান্তি যেনো সবাইকে গ্রাস করছে।
হলুদ লোকটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে
তার এখন ঘুম পাচ্ছে
হলুদ লোকটি ঘুমোতে যাবার আগে আরেক বার জেগে উঠবে।

(ইকবাল আজিজ)

(৩) আমার এখন খিদে পাচ্ছে ঘুম পাচ্ছে
ঘাম রক্তে মুঠোর ভেতর ভিজে যাচ্ছে মানচিত্র
তুই বললি মানচিত্র আমার হবে
কেন বললি?

(নাসিমা সুলতানা)

(৪) মা যে আমার তোমার পাশে
কালি-ঝুলি মুখে
তোমার উষ্ণ আবেগ খোঁজে
সন্তানদের দুখে

(ত্রিদিব দস্তিদার)

উল্লিখিত উচ্চারণ থেকে এই সময়ের কবিতার একটা সদর্থক রূপ আমরা অনুধাবন করতে পারি।

সত্তরের দশকের কবিতার মূল্যায়নে এক ধরনের অনীহা ও অস্বস্তি সমালোচকদের মধ্যে দেখা যায়। এর কারণ, যে-ভাঙনশীল সময়ে এই প্রজন্মের কবিদের আবির্ভাব, তখন অগ্রজ একাধিক প্রজন্মের কবিকুলের ঋদ্ধ ও পরিণত পদচারণায় মুখর ছিলো বাংলাদেশের কবিতালোক। নিজস্ব কাব্যমৃত্তিকা সম্পর্কে অহংবোধ, অগ্রজের প্রতি অনাস্থা, কাব্যভাষার ক্রমপরিশীলন, সর্বাপেক্ষা সমষ্টিলগ্ন চেতনার ধারক হওয়া সত্ত্বেও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বার্থপর প্রতিযোগিতা এই প্রজন্মের কবিতাকে অনেকটাই পরবাসী করে রেখেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং অন্ধকার সময়ের কবিপ্রতিনিধি এঁরা। অভিজ্ঞতালোকের দ্রুত রূপান্তর, সদ্য স্বাধীন দেশের মধ্যবিত্তজীবনের ভাঙন ও নির্মাণশীল পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি অস্তিত্বের প্রশ্নে আতঙ্কগ্রস্ত সমাজচারিত্র্য এই যুদ্ধোত্তর কবিগোষ্ঠীকে এক অনিকেত বাস্তবতায় নিক্ষেপ করে।

সবকালের কবিতারই একটা লোকরঞ্জক ধারা থাকে। সময়ের বিবর্তনে ঐসব কবিতার আকর্ষণ বহুলাংশে লোপ পায়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাল থেকে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যন্ত এই লোকরঞ্জক কবিতার একটি স্বতস্ফূর্ত প্রবাহ বিদ্যমান। জীবনের উপরিতলের অনুষঙ্গবাহী এইসব কবিতার সামাজিক তাৎপর্যও কখনো কখনো মুখ্য হয়ে উঠতে পারে। বিশ শতকের প্রথমার্ধের অনেক সমকালে জনপ্রিয় কবির কবিতা সামাজিক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে এখনো গবেষণা ও অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের নবোদ্ভূত কবিদের সুতীব্র জীবনাকাঙ্ক্ষা ও সংরক্ত অনুভূতিপুঞ্জ পূর্বপ্রতিষ্ঠিত, প্রাজ্ঞ, পরিণত কবিদের উজ্জ্বলতার কাছে বহুলাংশে ম্লান হয়ে যায়। উদ্ভ্রান্ত, দর্শনহীন, মীমাংসাশূন্য সমকালীন যন্ত্রণার রূপকল্প হিসেবে স্বীকারযোগ্য ঐসব কবিতার আবেদন পঞ্চাশ-যাটের দশকের কবিদেরকে অতিক্রম করতে পারেনি। আর অস্থির বর্তমানের চলমানতার পটভূমিতে সমাজগঠনের অস্থিতিশীল চারিত্র্য, বিপর্যস্ত মধ্যবিত্তজীবন, সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রের দ্রুত রূপ বদলে সাধারণ মানুষের মতো কবিদের জীবন ও জীবিকার পথকেও অনিশ্চয়তা-আক্রান্ত করেছে। পুঁজিবাদী বিশ্বের শৈল্পিক উত্তরাধিকারবোধে যাঁরা ঋদ্ধ হয়েছে, তাঁদের পক্ষে পেটি বুর্জোয়া স্বভাবের আধা-সামন্ত মুৎসুদ্দি পুঁজিনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিবাসী হিসেবে সীমাহীন মনোকষ্টে ভোগাই স্বাভাবিক। বাঙালি জাতি স্বাধীন পুঁজির বিকাশের লক্ষ্যে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছে। আধুনিক বিশ্বে একটি স্বতন্ত্র মানচিত্র, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতই যে একটি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নির্দেশ করে না, ঐ সময়ের তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের সচেতন অধিবাসীদের কাছে তা সুস্পষ্ট ছিলো। তবে সামরিক শাসন কিংবা ছদ্মবেশী গণতন্ত্রের দোলাচল সত্ত্বেও সমাজগতির স্বাভাবিক নিয়মের বিশ্বপুঁজির আনুকূল্য ও অনুগ্রহে বাংলাদেশের জনজীবনের সম্মুখযাত্রা অব্যাহত থেকেছে। রাষ্ট্রবিচ্ছিন্ন শিক্ষিত আধুনিক মধ্যবিত্তের চেতনায় আত্মকুণ্ডলায়ন ও আত্মরতির সমান্তরালে বিশ্বের বহুমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন ও নন্দনতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধিও লক্ষ করার মতো। ফলে, প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি অনাস্থার মতো প্রচল কাব্যবিশ্বাসেও এ সময়ের তরুণ-মানস আস্থা হারাতে শুরু করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির ফলে পৃথিবীর অনুন্নত, নিশ্চল ভূখণ্ডগুলোতেও কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হতে থাকে। পাশ্চাত্য বিশ্বের পুঁজির মুক্ত প্রসার বিশ্বায়নের নামে পরজীবী দেশগুলোর আর্থ-উৎপাদন কাঠামোকে অধিকতর নিগড়বদ্ধ করে তোলে। গণতন্ত্রের দীর্ঘ অনুপস্থিতি অগ্রজের সাধনা ও বিশ্বাসের প্রতি যে অনাস্থার জন্ম দেয়, আশির দশকের নবোদ্ভূত কবিদের অনুভব ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার প্রকাশ সুস্পষ্ট।

আশির দশকের নতুন কবিরা বাহ্যত অনাস্থা প্রকাশ করলেন অগ্রজের কাব্যচারিত্র্য, জীবনানুভব ও নন্দনচিন্তায়। রক্তিম সমাজজিজ্ঞাসা যে কবিতার মনোলোক ও শরীরকে বিক্ষত করতে পারে, সত্তরের দশকের নিকট-দৃষ্টান্ত থেকে এ ধারণা তাঁদের মধ্যে দৃঢ় ভিত্তি পায়। তাঁদের অনুভবে সমাজায়ত চিন্তা ও উপলব্ধি অপেক্ষা বিশ্বজনীন দর্শন ও বিজ্ঞানের নিত্য নতুন উদ্ভাবনা, মিথ-উৎসের নবমাত্রিক ব্যবহার, পরাবিদ্যার (metaphysics) অঙ্গীকার্য, এমন কি, বিশুদ্ধ নন্দনচিন্তার সমান্তরালে আধ্যাত্মিক বিশ্বাসেরও স্বীকরণ লক্ষ করা যায়। এই নতুন ধারার কবিদের স্বভাবধর্ম হয়ে দাঁড়ায়—অগ্রজের তিন দশকব্যাপ্ত বাহ্যত অভিন্ন

কাব্যচারিত্রে অনাস্থা; অনুষঙ্গের রূপান্তর; মননতৃষ্ণা, দর্শননির্ভরতা, মিথের সঙ্গে চৈতন্যের মিথষ্ক্রিয়া (সামাজিক অনুষঙ্গের নয়); বিজ্ঞানমনস্কতা, দেশজ ঐতিহ্যমগ্নতা এবং চেতনার বিশ্বমুখিতা।

আমরা জানি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকেই কবিতা প্রধানত মেধা, মনন ও বৈদগ্ধ্যের অনুষঙ্গী হয়ে উঠেছে। মার্কস-ফ্রয়েডের যুগান্তকারী উদ্ভাবনার সঙ্গে সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অস্তিত্বগত ও মনো-দৈহিক অবস্থারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়েই দর্শন ও বিজ্ঞানুষঙ্গের অনুপ্রবেশ ঘটে কবিতায়। মিথের অব্যাহত নবমাত্রিক ব্যবহারের দিক বিচার করলে, বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিতার আন্তঃসম্পর্ক অনেকটা কবিতার সমবয়স্ক। আশির দশকের অধিকাংশ কবিই একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁদের শৈশব-কৈশোর অতিক্রম করেছে। কিন্তু যুদ্ধের রক্তচিহ্ন অবচেতনলোকে স্থায়ী রূপ নেয়ার আগেই যুদ্ধোত্তর এক দশক ধরে অনেকগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত রক্তপাতের ঘটনা ঘটে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে। বয়সন্ধির কৌতূহল ও সংবেদন, যুদ্ধজয়ের আনন্দ, গণতন্ত্রের স্বপ্ন, দেশগড়ার আকাঙ্ক্ষা ম্লান হয়ে যায়। এ সময়ের কাব্যমনস্তত্ত্বের পটভূমি হিসেবে জাতিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের উল্লেখ অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। এই অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সমীক্ষা আশির দশকের কবিদেরকে সঙ্গত কারণেই নতুন কাব্যবস্তু-অন্বেষী করে তোলে। যে-সকল কবি পূর্বজ কবিদের প্রতি সীমাহীন অনাস্থায়, নববৃষ্টির অহংবোধে, দর্শনচিন্তায়, বিজ্ঞানমনস্কতা ও পরাবিদ্যাচর্চায় নবধারার কবিতা রচনা করলেন, তাঁদের মধ্যে খোন্দকার আশরাফ হোসেন, রেজাউদ্দিন স্টালিন, মোহাম্মদ সাদিক, ফরিদ কবির, মাসুদ খান, মঈন চৌধুরী, মারফ রায়হান, বদরুল হায়দার, সমরেশ দেবনাথ, সরকার মাসুদ, মুহীবুল আজিজ, মোহাম্মদ কালাম, দারা মাহমুদ, কাজল শাহনেওয়াজ, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সাজ্জাদ শরীফ, শোয়েব সাদাব, শান্তনু চৌধুরী, রিফাত চৌধুরী, কামরুল হাসান, খালেদ হোসাইন, সৈয়দ তারিক, গোলাম কিবরিয়া পিনু, আমিনুর রহমান সুলতান, সুহিতা সুলতানা, ফেরদৌস নাহার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত জনরঞ্জক কবিতার রচয়িতা যে নেই, তা বলা যাবে না। এ সময়ের কবিদের কাব্যবস্তুর ব্যাপকতা ও প্রকরণের সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্র ধরে আমরা এঁদের নতুন নন্দনচিন্তা ও কাব্যবিশ্বাসের স্বরূপ অনুধাবনে অগ্রসর হতে পারি। প্রথম পর্যায়ের কবিতায় বিশিষ্টভাবে দার্শনিকতা, অন্তর্মুখিতা, মিথিক উৎসের ব্যবহার, বিজ্ঞান ও পরাচিন্তার এক অদ্ভুত জঙ্গম আমরা লক্ষ করি। যেমন :

(১) মানুষ আত্মভেদী, আত্মনাশী নীল পতঙ্গ
একদিন সে পাঁজরের হাড় দিয়ে গড়েছিল এ পৃথিবী
একদিন মানুষই ধ্বংস করবে তাকে।
না ঈশ্বর না দেবতা না পাষাণ-মৃদঙ্গ না প্রভাত না
মধ্যরাতে নিমগ্ন বালিকা না ফোয়ারা না যোনি না
কবন্ধ বাতির ঘুম কোনো কিছু না
শুধু মানুষই পারে নিজেকে ভাঙতে।

(খোন্দকার আশরাফ হোসেন)

(২) দেয়ালের গল্প আমি অনেক শুনেছি
এইবার দিগন্তের গল্প কিছু বলি :
স্পর্শগ্রাহ্য এই দেয়ালের প্রতি মানুষের
জন্মগত ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও
আমি দিগন্তের দিকে হাত বাড়িয়েছি

(রেজাউদ্দিন স্টালিন)

(৩) আমাকে নেয়নি কোনো যুদ্ধ, আমাকে পেছনে ফেলে
বারবার চলে গেছে মিছিলের প্রতিধ্বনিগুলি!
আমার চৌদিকে আজ অন্যায়ের অন্ধকার এসে
ঢেকে দিচ্ছে যাবতীয় কাঙ্ক্ষিত দিনের কোলাহল

(ফরিদ কবির)

(৪) অভ্রংলিহ ইন্দ্রজালে পৃথিবী লিখেছি।
সীমাহীন শক্তির সীমানা নেই,
এখানে আমিও আছি।
বিন্দুর মিথ্যায় থাকে
শক্তির কাছাকাছি
অভ্রংলিহ
আমিও,
শক্তি।

(মঈন চৌধুরী)

অপেক্ষাকৃত কম উচ্চারিত এইসব পঙ্‌ক্তিমালা থেকে কবিদের আত্মদর্শনের স্তরগুলো আমরা স্পর্শ করতে পারি।

কবিতার ক্রমরূপান্তর কিংবা উত্তরণের কার্যকর উপাদান হলো মিথ। চিরকালই কবিতায় মিথ ব্যবহৃত হয়েছে। নতুন কবিতা সৃষ্টির জন্য মিথকে ভাঙতে হয় এবং তাকে নতুন অবয়বে রূপদানের মধ্যেই কবিতার পুনর্জন্মের শক্তি-উৎস নিহিত থাকে।

আশির দশকের কবিতায় বিশ্বমিথের সঙ্গে দেশজ মিথের অন্তর্বয়ন লক্ষ করা যায়। ভগ্নক্রম অবচেতনাপ্রবাহ, বর্তমানবিরাগী মনের অনুভূমিক বিশ্ববিহার, ঐতিহ্যের চেতনা-সাপেক্ষ প্রয়োগ এবং কাব্য অনুষঙ্গের বিপর্যাসের মধ্য দিয়ে ঐসব কবির কাব্যবস্তু ও কাব্যভাষায় ভিন্নমাত্রিক আলোড়ন সূচিত হয় :

(১) বীথিদের দগ্ধ হাড় থেকে আগুনের গন্ধ থেকে
বেরিয়ে এসেছে বলে, পালকে পাখায় আজো তাই
জ্বলন্ত বীথির ঘ্রাণ; যেন তোমাদের ধাবমান
সমস্ত শক্তির মধ্যে মিলিয়ে রয়েছে সব গাছের শরীর
অনেক অনেক বছরের বাতাসের অন্ধকার পরিভাষা।

এ ভাষা ভোজের, এ ভাষায় আগ্নেয় ফিনিক্স পাখি

আলোর প্রজ্ঞাপ্রণালী ঘুরে, একা, দূরে অপসৃয়মান।

(শান্তনু চৌধুরী)

(২) মাতাল নাবিক শুনে সুরাপাত্রে শব্দ হয়
নাবিক এখনি ভেসে যাবে ভাসমান মেডুসার দ্বীপ।
... ...
তিমির দ্বীপ ভাসছে যেন নগ্ন নারী
লাশের মতো বেহুলা-ভাষা নীল সাগরে।

(বদরুল হায়দার)

(৩) কুকুর
যুধিষ্ঠিরের অগ্রবর্তী কুকুর
তার ঐ লেজতরঙ্গের অপূর্ব তৃতীয় হারমোনিক্‌স্‌ আহা!

(মাসুদ খান)

(৪) একটি ত্রিশুল স্বপ্ন করেছে ভেদ
ছিটকে পড়েছে দুচোখ দিগ্বিদিকে
শিকড় ঢুকেছে গূঢ় মজ্জায় পাথর মেলেছে ডানা

(সাজ্জাদ শরিফ)

(৫) পরকীয়া এক দুস্তর কাঁটার বন
ওপথ ধরে কে আর হাঁটে—
রাধাই কেবল।।

(আমিনুর রহমান সুলতান)

(৬) মৃত্তিকার প্রগাঢ় বেদনা কী তা বুঝিনি এখনো
কান পেতে পাখির কথাবার্তা শুনি, প্রাণ পাই
মেঘলোকে বাহারী শাড়ির প্রদর্শনী দেখে শুধু শুধু মূর্ছা যাই
তবু কেন ডাকো আত্মহনন

(মারুফ রায়হান)

মিথ-উৎসের ভগ্ন-উল্লেখের সমান্তরাল এইসব কবি নির্মাণ করেন চেতনার বহুস্তর। আত্মখনন ও আত্মহননের তীব্রতায় মৃত্তিকার গভীরতাই শেষ পর্যন্ত আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে অনুষঙ্গ নির্মাণ বড় কথা নয়, আত্মকৃত সত্যকেই বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা প্রথম পর্যায়ের খোন্দকার আশরাফ হোসেন, রেজাউদ্দিন স্টালিন, ফরিদ কবির, মঈন চৌধুরী, মোহাম্মদ সাদিক, শান্তনু চৌধুরী ক্রমাগত পরিণতিমুখী হয়েছেন। প্রথম তিনজন রূপ অপেক্ষা ঐতিহ্য, আত্মভূগোল ও দর্শনানুসন্ধানেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। বাকিদের অনেকের নন্দনচিন্তায় উত্তরাধুনিকতার বহুস্তর, ব্যক্তিভূগোলের সীমাপ্রসারণ, প্রচল বিশ্বাসের পোস্টমর্টেম, মানবসম্পর্কের অকপট উন্মোচন, পরাবিদ্যার নতুন সংজ্ঞায়ন, এমনকি দু-একজনের মধ্যে বিজ্ঞানের অনুষঙ্গ, সত্য ও তত্ত্বের অভিনব কাব্যরূপ লক্ষ্য করি। যেমন—

(১) রাত গভীর হলে আমাদের এই প্রচলিত ভূ-পৃষ্ঠ থেকে
ঘুমন্ত কুড়িগ্রাম ধীরে ধীরে আলগা হয়ে যায়।

অগ্রাহ্য করে সফল মধ্যাকর্ষণ।
তারপর তার ছোট রাজ্যপাট নিয়ে উড়ে উড়ে
চলে যায় দূর শূন্যলোকে।

(মাসুদ খান)

(২) যুগ যুগ অন্তহীন চিঠির ফোয়ারার বদলে, ইলেকট্রিকের বিল
ধ্রুবতারার বদলে, এন্টেনা।
সলতে উসকে দেয়া কুপির বদলে, ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প।

(রিফাত চৌধুরী)

(৩) হিমযুগ।
স্ফিংসের স্তব্ধ মূর্তির ছায়া
ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে
মরুভূমি থেকে দূর সমুদ্র পথে।

(শোয়ব শাদাব)

(৪) বৃক্ষের ক্রোমোজম হত্যা করো না।
নির্ভীক ত্রিভুজ নিয়ে অপেক্ষায় থাকি,
সমুদ্র বালুবেলায় কয়েকটা কোকিল
সৃষ্টির ইজেলে খোলা খাতার পাতা।

(মঈন চৌধুরী)

বিজ্ঞানানুষঙ্গের প্রয়োগ এ-প্রজন্মের কবিতায় একটা মৌলিক লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। বিজ্ঞানের বস্তুময়তা কিংবা তত্ত্বময়তা নয়, জীবনপ্যাটার্নের রূপান্তরের সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতাকে অনিবার্য রূপ দিলেন কবিরা। এ ক্ষেত্রে মাসুদ খানের কবিমন, কাব্যবস্তু ও কাব্যভাষায় বিজ্ঞানেরই সার্বভৌমিত্ব। এইসব কবির নিসর্গ, নক্ষত্রলোক, গ্রামীণ পরিমণ্ডল, নস্টালজিয়ার ভূমিক্ষেত্র পর্যন্ত বিজ্ঞানের অনিবার্য প্রবেশে যন্ত্রময়।

শুদ্ধ শিল্পময়তার চর্চা সবকালের কবিতাতেই আমরা কমবেশি লক্ষ করি। কখনো তা মনোদৈহিক সত্য উন্মোচনের প্রয়োজনে, কখনো-বা সামাজিক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে পলায়নের লক্ষ্যে; আবার কখনো কখনো পরাবিদ্যা ও রহস্যময়তার শতগ্রন্থিল ভাবলোকে অবগাহনের ঐকান্তিকতায়। সকল সৎ কবির মধ্যেই শুদ্ধ শিল্প বা নন্দনতত্ত্বের অঙ্গীকার কমবেশি বিদ্যমান। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে আধুনিক কবির পক্ষে অতিক্রম করা অসম্ভব। বিশেষ করে, তথ্যপ্রযুক্তির সম্প্রসারণের ফলে জ্ঞান ও শিল্পকলার বিশ্বায়ন সাম্প্রতিক কবিতার শেকড়কে সমান্তরালভাবে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ করে তুলেছে। কবিতার মন হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন আর শরীর দেশজ। সময়স্বভাবের এই বিচিত্রগতির আবর্তে কবিতার চরিত্রও হয়ে উঠেছে অস্থির।

॥ চার ॥

বিশ শতকের শেষ দশকে যে সকল কবি স্বাবলম্বী কাব্যপ্রত্যয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন, এঁদের অধিকাংশেরই হাতেখড়ি আশির দশকের শেষ দিকে। সময়ের শিল্পচারিত্র্যই এই সব

কবিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে। এইসব কবির মধ্যে আমরা লক্ষ করবো, শুরুতেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা, সৃজনের আত্মমুগ্ধতা এবং কবিসুলভ তীব্র অহংবোধ। পূর্বতন দশক থেকে যার চারিত্র্য কিছুটা ভিন্ন। এ সময়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য হলো, কাব্যভাষা, শৈলী, প্রতীক ও চিত্রকল্পের প্রচলিত ধরনের (paradigm) প্রতি অনাস্থা; নতুন কাব্যচারিত্র্য সন্ধানের লক্ষ্যে অনুষঙ্গের রূপবদল; বর্তমান সচেতনতা, দর্শন ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রশ্নে পূর্বানুগামিতা; অতিমাত্রায় আত্মমুখী এবং আত্মকেন্দ্রিক।

সমাজচারিত্র্যের মধ্যে ব্যক্তির জীবন ও মনোগঠনের ব্যাকরণ সৃষ্টি হয়। মুক্তিযুদ্ধোত্তর তিন যুগে বাংলাদেশের সমাজজীবনের বহুমুখী ভাঙাগড়া ও উত্থান-পতনে এর সৃজনশীল মনোজগতের সূচিত হয়েছে অভূতপূর্ব রূপান্তর। শতাব্দী-সংক্রান্তির অস্থিরতায়, বিশ্ব পুঁজিবাদ, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বহির্চাপ এবং দেশী রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অন্তর্চাপে এ সময়ের তরুণ মানস সঙ্গত কারণেই ক্রমাগত অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে। এই অন্তর্মুখিতার স্বভাবধর্ম পূর্বতন যে-কোন সময়ের চেয়ে স্বতন্ত্র। প্রচলিত বিশ্বাসে অনীহা, সমাজ-রাজনীতি ও রাষ্ট্রের কূটচরিত্রে অনাস্থা, মূল্যবোধের প্রচলিত স্তম্ভগুলোর প্রতি অবিশ্বাস এবং অগ্রজের কৃতি ও কীর্তির প্রতি সীমাহীন অশ্রদ্ধায় এই প্রজন্মের মনোলোক বিদীর্ণ ও রক্তাক্ত। মনোজগতের রক্তপাতে অবসন্নতার পরিবর্তে জন্ম নেয় ক্রোধ ও ঘৃণা। এ ঘৃণা সমাজব্যবস্থার প্রতি, পূর্বজন্মের বিশ্বাসের প্রতি, এমন কি, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ধ্বস্ত বিকলাঙ্গ ধরনের প্রতি। ফলে এঁদের আত্মকেন্দ্রিকতা আনুবীক্ষণিক গহনচারিতায় পরিণত হয়। এই প্রজন্মের কবিদের মধ্যে ব্রাত্য রাইসু, টোকন ঠাকুর, চঞ্চল আশরাফ, আলফ্রেড খোকন, জেনিস মাহমুন, বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, জাফর আহমদ রাশেদ, তুষার গায়েন, মাহবুব কবির, মাসুদুল হক, তপন বাগচী, সরকার আমিন, আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ, শাহনাজ মুন্নী, অলকানন্দিতা, আয়েশা ঝর্ণা, কবির হুমায়ুন, পাবলো শাহী, খলিল মজিদ, এজাজ ইউসুফী, শামীম কবির, শামীম রেজা, সিদ্ধার্থ হক, শামসুল আরোফিন, শোয়াইব জিবরান, রওশন ঝুনু, হেনরি স্বপন উল্লেখযোগ্য। জিজ্ঞাসায়-বেদনায়-আর্তনাদে-হতাশা ও আত্মনিমজ্জনের নতুন কাব্যরূপ সন্ধানে এই সব কবি এখনো সক্রিয়। নব্বইয়ের দশকের নবোদ্ভূত কবিদের একটা বড়ো অংশ আত্মনিমজ্জন ও অনুভূমিক মানস-প্রসারণের ক্ষেত্র হিসেবে প্রত্ন-ইতিহাস, লোকঐতিহ্যের আদিভূমি ও দেশিবিদেশি কাব্যকলার চরিত্র সন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠেন। মাতৃজরায়নের অন্ধকারলোক সন্ধান, মরমিয়া শিল্প-ঐতিহ্যে অবগাহন প্রভৃতিকে কাব্যোপকরণের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন তাঁরা। যেমন,

(১) কৈশোরক এই কুয়ো...ভিতরে প্রত্নছায়া, ছোবল!
আর আমি জর্জরিত-মধ্যযাত্রা ভেঙে দাঁড়িয়েছি
এই ভুল চন্দনের গন্ধে...আহা রেশমী কল্লোল
ছুঁয়ে ঝড়ে বেলফুল...আবু তবু বিভীষায় গেছে...

(টোকন ঠাকুর)

(২) এই পাখি বার্তাবহ
শীতের

এই শীত পৃথিবীর ছোট বোন।

(মাহমুদ কবির)

(৩) এখানেই আছে প্রিয় সিনীবালি
আমি আছি যাজকের বেশে সত্যম উপযাজক
হাড়ে কাপালিক জ্যোৎস্না...ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ব্রতক্রীড়াসঙ্গিনীর দেশ।
হাঁটিতে জানো কি সিনীবালি?
বসিতে জানো কি সিনীবালি চৌকো শিলাখণ্ডে?
সাম আমি, তোমার ঋকের চাহিদায়
আমি সাম
নাচের প্রসঙ্গে তুমি কেবলি সা চন্দ্রোদয়ে সাঙ্গীতিক রোলে
তুমি সা কেবলি, জলের ওপরে নৃত্যরত আলোকে-তরঙ্গে
সিনীবালি, এসো-
আমি সাম।

(বায়তুল্লাহ্ কাদেরী)

(৪) গোয়ালে নিভেছে দীপ, বধূ ভয়াতুর
মধু চুরি করে নিয়ে যায় মাছি
অকস্মাৎ বহু রাতে পিকনিক বাস এসে
থেমে যায় পুরানো গুহার কাছাকাছি

(কামরুজ্জামান কামু)

(৫) ভেসে তো এলাম অন্ধের পালহীন মাংশডিঙ্গায়
বায়ুস্রোতে সব মেঘ চলে গেছে পাহাড়ের দিকে—
রৌদ্রক্ষরণে তবু নিদ্রা এসেছে হয়ে
ফিকে
এসে তো গেলাম, অনন্তের ঝাপসা লাল
দিগন্ত-রেখায়;
ঘূর্ণিত জলের তোড়ে ভুলে গেছি
বৃক্ষ ও পাখিদের হলুদ প্রার্থনা
কোথায় পাতাল বলো, কোথায় মোহনা

(চঞ্চল আশরাফ)

প্রত্ন-স্মৃতিলোকে এই বিহার কবিতার ভাষারূপেও অনিবার্য পরিবর্তন সাধন করে। নাগরিক বৈদগ্ধ্য দিয়ে এরা আঘাত করে নগরকে, শাহরিক কৃত্রিম জীবনপ্রণালীকে। গোড়া থেকেই একটা আউটসাইডার চেতনায় বর্তমান সভ্যতা, নগরসংস্কৃতি, অগ্রজের প্রতিষ্ঠিত শিল্পলোক, ভাষাভঙ্গি, চিত্রকল্পের প্রকৃতি, উপমান-উৎস সবকিছুকেই এঁরা অস্বীকার করতে উৎসাহী। সত্তার অণু-পরমাণু সন্ধানের ঐকান্তিকতায় এই প্রজন্মের কবিদের মধ্যে কবিতার একটা আধ্যাত্মিক চেহারাও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। পৃথিবীব্যাপী ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মান্ধতার বিপজ্জনক টানাপোড়েনের মধ্যে সত্তাসন্ধানকামী কবির এই নতুন কাব্যবস্তু সন্ধান নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। তবে বাঙালির মরমিয়া-

বাদের সঙ্গে এই আধ্যাত্মবাদের শিল্পিত সাহচর্যের ফলে কবিতার একটা নতুন ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়। যেমন—

(১) প্রভু আমাদের কলুষিত তনুর মার্জনা নাও প্রভু
প্রভু আমাদের বিনীত আত্মার আর্তনাদ নাও প্রভু
প্রভু আমাদের কণ্ঠস্বর অধিলৌকিক ঘন্টাধ্বনি প্রভু
প্রভু আমাদের পুড়ন্ত আত্মা লোবান ও ধূপের সুগন্ধ প্রভু
প্রভু তোমার বেদিতে আমরা উৎসর্গকৃত প্রাণ
প্রভু তোমার বেদিতে আমার পুষ্প
আমাদের দৃষ্টিপথ অবগুণ্ঠন মুক্ত কর প্রভু

(জেনিস মাহমুন)

(২) জানা ছিলো জানা ছিলো জানা ছিলো সমস্ত খবর
মানুষ এক কবর থেকে ওঠে খোঁড়ে আরেক কবর।

(সরকার আমিন)

(৩) জন্মে জন্মে যে গীত করেছি আমি—শবগাড়ি করে
নিয়ে যাবে এই ফুল—অর্থাৎ পাললিক জৈবস্তুর এই দেহভার,
তবু আজ রাতে মৃতের প্রার্থনা গীতে ফোটে এই ফুল
পাপড়ি প্রকাশ ক'রে বলে সকল জীবের কথা
জীবে অ-জীবে এই ফুল জন্ম এবং পতনের গাথা।

(আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ)

(৪) জেনিছি তুমি আলোর অভিধান
আর জেনিছি তোমার সম তাপ
প্রতি জন্মে নির্ধারিত পাপ
বজ্রে আমার এমনি উদ্‌গান।

(খলিল মজিদ)

(৫) সারিন্দা বাজায় বুঝি কোন নিরাকারে
কপাটে কখনো দেখি তাহাকে সাকারে
তুমি কি মৃন্ময় প্রভু, তুমি কি চিন্ময়?

(শাহনাজ মুন্নী)

এ-জাতীয় আরও অনেক দৃষ্টান্ত নব্বই-এর দশকের বাংলাদেশের কবিতা থেকে পাওয়া যাবে। আত্মবীক্ষণের তীব্রতায় কবিতার উপকরণ যে বহুলাংশে পাল্টে গেছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

॥ পাঁচ ॥

আমাদের কবিতায় শূন্য দশকের সূচনা মানবীয় সংবেদনার ব্যাপক ভাঙাগড়ার পটভূমিকায়। পূর্বজদের কাব্যবিশ্বাসে আস্থা কোনো নতুনকালের কবিরই থাকার কথা নয়। মৌলিক কবিরা

জীবনানন্দ দাশের মতোই হয়তো বলবেন, "কেউ যাহা জানে নাই কোনো এক বাণী/আমি বহে আনি;/একদিন শুনেছ যে-সুর/ফুরায়েছে, পুরানো তা কোনো এক নতুন-কিছুর/আছে প্রয়োজন, /তাই আমি আসিয়াছি, আমার মতন/আর নাই কেউ"—কিন্তু বাংলাদেশের সমাজসংস্থা ও রাষ্ট্রীয় বিন্যাসে যে ধারাবাহিক অসঙ্গতি বিদ্যমান, সে পরিপ্রেক্ষিতে ভালোবাসার রক্তাক্ত মৃত্তিকায় অনাস্থা এবং ঘৃণাই নতুন উদ্ভিদে রূপান্তরিত হতে পারে। এই যন্ত্রণার সূত্রপাত আশির দশক থেকেই, নব্বইয়ের দশকেও স্বস্তি ও আস্থা দেখিনি; শূন্য দশকের পথিকরা নতুন কালের অভিজ্ঞতায় পারলে বিগত শতাব্দীকেই যেন তাড়িয়ে বেড়ায়। বিশ্বব্যবস্থা ও দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আস্থাহীন তরুণ কবির চেতনায় আত্মকুণ্ডলায়ন ও আত্মরতিরও যেন অবকাশ নেই পূর্বজদের মতো। বিশ্বের বহুমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও নন্দনতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ আছে, কিন্তু সেগুলোর প্রতি গভীর মমতা নেই; একটা অস্থির অবিশ্বাসে সেগুলোকে প্রত্যক্ষ করা কেবল। ফলে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি অনাস্থার মতো প্রচল কাব্যবিশ্বাসেও আস্থা হারাতে শুরু করেন তারা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির ফলে পৃথিবীর অনুন্নত, নিশ্চল ভূখণ্ড-গুলোতেও কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হতে থাকে। এই সময়ের কবিরা বুঝতে পারেন, পাশ্চাত্য বিশ্বের পুঁজির মুক্তপ্রসার বিশ্বায়নের নামে পরজীবী দেশগুলোর আর্থ-উৎপাদন কাঠামোকে অধিকতর নিগড়বদ্ধ করে ফেলেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উপভোগ প্রভৃতি কেবল পুঁজির অনুগত। পূর্বজদের প্রতি এ কারণে ক্ষুব্ধ অভিমানও জেগে ওঠে মনে। এই ব্যর্থতার দায় যে তাদের এককভাবে প্রাপ্য নয়, অভিমানী অহং তা বুঝতে চায় না। ফলে, পিতৃতর্পণের পরিবর্তে পিতৃশ্রাদ্ধই যেন নিয়তি হয়ে ওঠে তাদের কাছে। একুশ শতকের তরুণ কবিরা অগ্রজের কাব্যচারিত্র্য, জীবনানুভব ও নন্দনচিন্তায় কেবল অনাস্থাই প্রকাশ করলেন না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্বীকার করলেন। গোড়া থেকেই একটা অপরিচয়ের বিস্ময় নিয়ে আগন্তুকের চোখে বর্তমান সভ্যতা, নগরসংস্কৃতি, অগ্রজের প্রতিষ্ঠিত শিল্পলোক, ভাষাভঙ্গি, চিত্রকল্পের প্রকৃতি, উপমান-উৎস সবকিছুকেই তারা অস্বীকার করতে উৎসাহী। সত্তার অণু-পরমাণু সন্ধানের ঐকান্তিকতায় এই প্রজন্মের কবিদের মধ্যে কবিতার একটা আধ্যাত্মিক চেহারাও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, অনেকটা নব্বই-এর দশকের মতো। পৃথিবীব্যাপী ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মান্ধতার বিপজ্জনক টানাপোড়েনের মধ্যে সত্তাসন্ধানকামী কবির এই নতুন কাব্যবস্তু সন্ধান নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। শতকসূচনার কাব্যযাত্রায় শামিল হয়েছেন এক ঝাঁক তরুণ। তাঁদের তালিকা দীর্ঘ। বিষয় ও রূপসচেতন কয়েকজন কবি হলেন : জাহানারা পারভীন, ফেরদৌস মাহমুদ, সোহেল হাসান গালিব, ফারুক আহমেদ, মাদল হাসান, নিতুপূর্ণা, দেবাশীষ তেওয়ারী, নওশাদ জামিল, ফারহান ইশরাক, এমরান কবির, পিয়াস মজিদ, মাহমুদ শাওন, অনন্ত সুজন, আরিফ টুকু, জুয়েল মুস্তাফিজ, নির্লিপ্ত নয়ন, আমজাদ সুজন, তালাশ তালুকদার, মামুন রশীদ, মাহমুদ হাসান, অরূপ রাহী, সাব্বির আজম প্রমুখ। এসব কবি করুণ সময়কে নতুন চোখে পর্যবেক্ষণে মনোযোগী। এই দশকের কাব্যপ্রবণতাগুলোকে কোনো কবিই সমগ্রভাবে ধারণ করেননি এখনও। সব কবির সব কবিতা একসঙ্গে দেখলেই বোঝা যাবে শূন্যের প্রকৃত চেহারা ও সারবত্তা। প্রচল- বিরোধের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সম্পর্ক সবকালেই প্রায় সমান্তরাল অথবা ব্যক্তি কখনও কখনও পারে নিজের অতীতসত্তার বিরোধী হতে। এর কারণ, নিজের অতীত-ব্যাকরণ ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি

অবহিত থাকে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক তরুণ কবিদের কবিতার শব্দ, ধ্বনি ও চিত্রকল্পের বিন্যাসে নতুনত্ব ও সম্ভাবনার লক্ষণ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা জানি, শিল্পবিশ্বের অধিকাংশ নতুন বোধের গর্ভাশয় তরুণ-মানস। সময়ের জঙ্গমতার ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব কাব্যবীজ সৃষ্টির প্রেরণা-উৎস। একবিংশ শতাব্দীতে যেসব তরুণ কবির কাব্যযাত্রার সূচনা, সময়ের জঙ্গমতার সঙ্গে এক অস্থির বিশ্বাসহীনতার বোধ তাদের কবিতার অন্যতম লক্ষণ হয়ে উঠেছে। এই বিশ্বাসহীনতা দর্শন, বিজ্ঞান কিংবা পূর্বপুরুষের চিন্তা-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে নয়; মানবায়নের সামগ্রিক প্রকৃতিরই বিরুদ্ধে। বাচনভঙ্গি থেকে শুরু করে আত্মপ্রকাশের সব প্যারাডাইমের বিরুদ্ধে। এ ক্ষেত্রে মূল্যবোধের স্থানটিই যেন সবচেয়ে বেশি রক্তাক্ত ও বিপন্ন। পূর্ববর্তী কালপরম্পরায় ব্যক্তিত্বগঠনের কাঠামো থেকেও তারা অনেকাংশে পৃথক। পঠনবিশ্বের সঙ্গে অভিজ্ঞতালোকের মিলে যাওয়ার লক্ষণও কারও কারও মধ্যে স্পষ্ট। এই মিলন বা সঙ্গতি অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য যুক্তিবর্জিত। এটা যে অজ্ঞানতাপ্রসূত নয়, সজ্ঞান প্রচেষ্টার ফল কবিতার অনুভূতি-বিন্যাসে তা প্রমাণিত।

সব কালের কবিতারই একটা নিজস্ব ভাষারীতি থাকে। কেননা আমরা জানি, ভাষার চলমানতা সময়ের মতোই দ্রুতগামী। তবুও পূর্বজ কবিদের অভিজ্ঞতালোক, শব্দচেতনা ও ভাষারীতি নতুন কালের কবিরা অতিক্রম করতে পারেন না। মানুষকে যেমন শেকড়ের কাছে যেতে হয় অস্তিত্বের প্রয়োজনে—কবিতাকেও তেমনি মিথ-উৎস কিংবা ঐতিহ্যলোকের মতো অগ্রজের অভিজ্ঞতালোকেও কখনো কখনো পরিভ্রমণ করতে হয়। নতুন কালের কবিতার বিস্তৃত মূল্যায়নের জন্যে, একটা পূর্ণবৃত্ত কাব্যবস্তু, ভাবলোক ও ভাষারূপ সন্ধানের লক্ষ্যে, আমাদেরকে আরো কিছুটা কাল হয়তো অপেক্ষা করতে হবে।

❑ প্রাবন্ধিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সাহিত্য বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক—**সম্পাদক**।